নদীপথে
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

নদীপথে

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

শিক্ষা ও সভ্যতা
কাব্যজিজ্ঞাসা
জমির মালিক
সমাজ ও বিবাহ

নদীপথে

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
কলিকাতা

পর-পর তিন বড়দিনের ছুটিতে বাংলা ও আসামের নদীতে বেড়াবার সময় স্টিমার থেকে যে-সব চিঠি লিখেছিলাম, কিছু রদবদল করে সেগুলিকে ছাপানো গেল এই ভরসায় যে, পাঠক-সাধারণকেও তা কিঞ্চিৎ আনন্দ দিতে পারে। ইতি

আষাঢ় ১৩৪৪ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
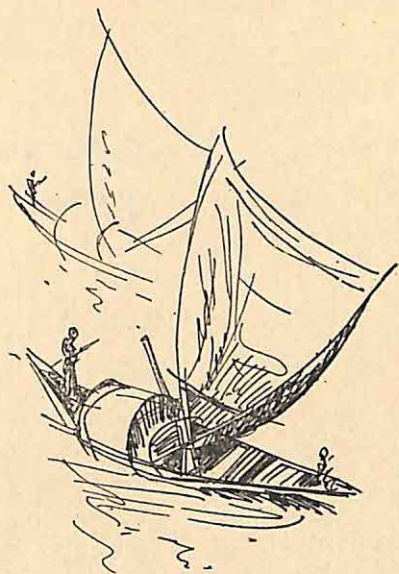
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী
কল্যাণীয়াসু

'মিঙ্গিন' স্টিমার
২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪
সোমবার। সন্ধ্যা

শনিবার রাত দশটায় ছেলেরা স্টিমার থেকে নেমে গেলে অল্পক্ষণ পরেই শুয়ে পড়া গেল। রাত দুটোয় একবার উঠেছিলাম। চার দিকে আলো। স্টিমার পুল খোলার প্রতীক্ষা করছে।

রবিবার প্রাতে উঠে স্টিমার কতদূর এল খোঁজ নেবার জন্য বাইরে এসে দেখি, সামনেই জগন্নাথ ঘাটের স্টিমারের গুদাম ও আপিস। ব্যাপার কি? সারেং এসে খবর দিল যে, শনিবার শেষ-রাত্রে পুল খোলার সময় বিলাতি ডাক এসে পড়ায় তখন পুল খোলা যায় নি, এবং পরে আর খোলা সম্ভব ছিল না, সুতরাং রবিবার শেষরাত্রের পূর্বে স্টিমার ছাড়বে না।

আবার বাড়ি যাওয়া ও ফিরে আসার হাঙ্গামা মনে করে রবিবার সমস্ত দিন ও রাত জগন্নাথ ঘাটের সামনে গঙ্গার মাঝে কাটিয়ে দেওয়া গেল—যখন তোমরা মনে করছিলে যে আমি বহু দূর চলে গেছি।

কলকাতার নীচের গঙ্গার উপর যে একটা বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রতিদিন চলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। ভোর হতেই নদী জুড়ে নানারকম নৌকার ও নানা চেহারার বাষ্পীয় জলযানের ব্যস্ত গতায়াত আরম্ভ হয়— লোক নিয়ে, মাল নিয়ে এবং বাহ্য-দৃষ্টিতে অকারণে। দুপুরের পর এ গতি কিছু মন্দা হয়ে আসে; আবার বিকাল হতে-না-হতেই নদী যেন গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে আলস্য ভেঙে ওঠে। নৌকার দলের গতি দ্রুত হয়, বাষ্পীয় যানগুলি গম্ভীর ও তীক্ষ্ণ আওয়াজ করতে করতে জলচর প্রাণীর মত উজান-ভাটিতে ছুটতে থাকে। মধ্যাহ্নের জনবিরল নদী লোকসমাগমে ভরে ওঠে। একটা দিন এই দেখে কাটল।

রবিবার রাত সাড়ে চারটেয় হাওড়া-পুল খোলার সঙ্গে সঙ্গে স্টিমার ছেড়েছে। একখানা ফ্ল্যাট বাঁ পাশে প্রথম থেকেই বাঁধা ছিল। সোমবার সকাল ছটায় বজবজে ডান দিকেও আর-একখানা ফ্ল্যাট বাঁধা হয়েছে। দু দিকে দুই ফ্ল্যাট নিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে আমাদের স্টিমার চলেছে।
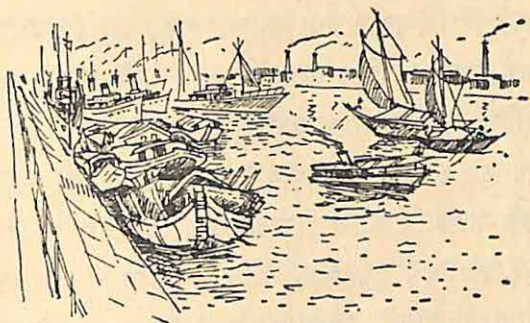
স্টিমারখানি ভালো ও নূতন। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জল ও পাট দিয়ে প্রতিদিন ডেক মাজা হচ্ছে। আমিই একমাত্র যাত্রী। সুতরাং সবগুলি কেবিন যদৃচ্ছা ব্যবহার করছি।

সারেংটির বাড়ি নোয়াখালি। মাথায় একটু ছিট আছে। পঁয়ত্রিশ বছর স্টিমারে কাজ করছে, এখন মাইনে এক শ আশি টাকা। আমাকে জানালে যে, চামড়া কালো ব'লে মাইনে এত কম; সাদা চামড়া হ'লে পাঁচ-ছ শ হত। এবং এই চামড়ার তফাতের জন্যই নাকি, যদিও তার স্টিমারে একজন ভারী বাবু যাচ্ছে, তবুও স্টিমার-কোম্পানি সামনের ডেকে একটাও ইজিচেয়ার দেয় নি, দুটো বেতের

কুর্সি দিয়েই সেরেছে। আগের বছর এই স্টিমারেই এক সাহেব গিয়েছিল, বিশেষ ভারী নয়; তখন ইজিচেয়ার, পর্দা এবং পাঁচ মণ বরফ ছিল। পাঁচ মণ না হলেও বরফ এবারও আছে। সেই বরফে তরি-তরকারি তাজা রাখা হচ্ছে। এই যে ছু দিকে ছুই ফ্ল্যাট বেঁধে দেওয়া, সারেঙের মতে এও একটা সাদা-কালোর ভেদবুদ্ধির ব্যাপার। আমাদের স্টিমারের সঙ্গে আরও একখানা সুন্দরবনগামী স্টিমার ছেড়েছে। বজবজের ফ্ল্যাটখানি নাকি তারই নেবার কথা। কিন্তু তাতে তিন-চারটি সাহেব যাচ্ছে ব'লে এই উলটো ব্যবস্থা হয়েছে।

বেলা সাড়ে দশটায় ডায়মণ্ড হারবার ছাড়িয়েছি। সেখান থেকেই নদী বেশ প্রশস্ত। স্টিমার বাঁ পাড় ঘেঁষে এসেছে। ঢালু পাড়; অনেক জায়গায় প্রায় জল পর্যন্ত ঘাস ও ছোটো ছোটো গাছ-গাছড়া। কোথাও কাছে, কোথাও দূরে লোকের বসতি। অন্য পাড়ে গাছের ঘন সবুজ সরু রেখা ছাড়া কিছু দেখা যায় না।

বেলা প্রায় চারটেয় স্টিমার বড় নদী ছেড়ে

একটি সরু খালে ঢুকেছে। খালের নাম 'নামকানা' খাল। এত সরু যে, ছুই ফ্ল্যাট-সমেত আমাদের স্টিমার তার প্রায় সবটাই জুড়ে থাকে। এই খাল দিয়ে অতি আস্তে আস্তে চ'লে ঘণ্টাখানেক পরে একটি মোটের উপর প্রশস্ত নদীতে পড়া গেল, নাম 'সপ্তমুখী'। কিন্তু এমন অগভীর যে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে স্টিমার নোঙর করতে হল। জোয়ার এলে তবে চলবে। নামকানা খালই সুন্দরবনের আরম্ভ। কিন্তু খালের ছুই পাশে এবং সপ্তমুখী নদী যতটা এসেছি তার পাড়ে এখন আর বন নেই। চাষ-আবাদ ও লোকালয়। সারেং বললে, আরও চার ঘণ্টা চলার পর সুন্দরবনের বন আরম্ভ হবে।

শীত যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন কিছু নয়। আজ সমস্ত দিন স্টিমার দক্ষিণে চলেছে, সুতরাং উত্তরের হাওয়া লাগে নি। সামনের ডেকে সারাদিন রোদ। আরামে চলে এসেছি।

জোয়ার এসেছে। নোঙর তুলে স্টিমার চলতে আরম্ভ করল। রাত প্রায় আটটা। খুলনা পৌঁছনো পর্যন্ত রাতদিন স্টিমার চলবে, কোথাও থামবে না।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৪

মঙ্গলবার। সন্ধ্যা

আজ ভোর থেকে এবং কাল রাত্রে যখন ঘুমিয়ে ছিলুম নিশ্চয়ই তখন থেকেই স্টিমার চলেছে আঁকাবাঁকা সব ছোট ছোট নদী দিয়ে। মাঝে মাঝে বেশ প্রশস্ত নদী পাওয়া যাচ্ছে। দু পারে যত দূর চোখ চলে ডালপালা-বিরল সোজা সরু গাছ ও আগাছার ঘন জঙ্গল। চাষ-আবাদ, খোলা জমি ও জনমানবের চিহ্ন নেই। আকাশে পাখি নেই, কাকও নয়। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ দু-একটা শঙ্খচিল উড়ে যাচ্ছে; আর দুটো-একটা বক জলের ধারে স্তব্ধ তন্ময় হয়ে পরমার্থচিন্তার কায়দায় মৎস্যচিন্তা করছে। বনের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট সব খাল এসে নদীতে পড়েছে। আমরা যে-সব নদী দিয়ে যাচ্ছি তা ছাড়া বহু ছোট বড় নদী চার দিকে বয়ে চলেছে। কোনো জায়গায় একখণ্ড বনে ঢাকা জমির তিন দিকেই নদী— দেখতে চমৎকার। এ-সব নদী-নালার মধ্য দিয়ে পথ চিনে স্টিমার চালানো অভ্যাসের কাজ। সারেং বললে যে, এ পথ সম্বন্ধে

সারেংদের পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হয়। বনের ধারে ধারে টিনে সাদা রং দিয়ে পথের চিহ্নও অনেক জায়গায় দেওয়া আছে।

বেলা আন্দাজ সাতটায় সুন্দরবন ডেস্‌প্যাচ্‌-সার্ভিসের একখানা কলকাতাগামী স্টিমারের সঙ্গে দেখা হল। নাম 'বুরানওয়ালি'। দুখানা ফ্ল্যাট দু দিকে নিয়ে চলেছে। সেখানে নদী এত ছোট যে আমাদের স্টিমার এক পাশে দাঁড় করিয়ে তাকে পথ দিতে হল।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় একখানা ছোট নৌকা দেখা গেল। বোঝা গেল লোকালয় কাছে এসেছে। অল্পক্ষণ পরে নদীর ধারে গাছের তলায় কয়েকটা বানরের দেখা পাওয়া গেল। শুনলুম

অনেক ভাগ্যবান লোক আমার মত সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে স্টিমারে যেতে হরিণের দল ও রয়াল বেঙ্গল বাঘ দেখতে পেয়েছে। আমার ভাগ্য বানরের উপর আর উঠল না।

মুসলমানদের এটা রোজার মাস। স্টিমারের দোতলার পিছনের ডেকে যেখানে মাল বোঝাই আছে তার কতকটা পরিষ্কার ক'রে তেরো-চোদ্দোজন স্টিমারের খালাসি ও কর্মচারী সূর্যাস্তের পর নমাজ পড়ে। একসারে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ওঠাবসা করে; দেখতে বেশ। এর অনেকটাই যে আমাদের পূজা-অর্চার মতই বাহ্যিক কসরত মাত্র তা মনে করতে ঠিক এখন ইচ্ছা হচ্ছে না। নমাজের পর সকলে গোল হয়ে ব'সে রোজা ভাঙে অর্থাৎ খেতে আরম্ভ করে। এক-এক থালায় দু-তিনজন খাচ্ছে। খাদ্য ডাল ভাত এবং একটা কিছু তরকারি। এরা সমস্ত দিন উপবাসী থেকে স্টিমারের খালাসির হাড়ভাঙা খাটুনি মুখ বুজে সমানে খেটে যাচ্ছে। পূর্ব-বাংলার এই মুসলমান খালাসিদের দেখে বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু ভরসা হয়।

সারেং বলছে, আজ রাত আন্দাজ দশটা-এগারোটায় স্টিমার খুলনা পৌঁছবে। তার পর খুলনা থেকে বরিশাল যাবে চার-পাঁচ জায়গায় থেমে মাল নামাতে নামাতে। স্টিমারের কেরানিবাবু (বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক) বললেন যে, বৃহস্পতিবারের পূর্বে বরিশাল পৌঁছনো যাবে না। আমার রবিবার কলকাতা পৌঁছতেই হবে। সুতরাং এবার আর গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাওয়া হল না। বরিশাল থেকেই বরিশাল-খুলনা এক্‌স্‌প্রেস্‌ স্টিমারে খুলনা হয়ে কলকাতা ফিরব।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৪
বুধবার। ভোর ৭টা

কাল রাত দশটায়, যখন খুলনা পৌঁছতে মাত্র ঘণ্টা দুই দেরি, তখন কুয়াশার জন্য স্টিমার নোঙর করতে হল। কুয়াশা কিছু বেশি নয়; জ্যোৎস্নায় নদীর পারের গাছপালা বেশ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কুয়াশার জন্য সার্চলাইটের আলো ভালো না খোলায় শেষে নৌকা চাপা পড়ে এই ভয়ে সারেং স্টিমার নোঙর করে রাখে। আজ ভোর-রাত্রে ছেড়ে এই মাত্র খুলনা পৌঁছল। বেলা বারোটা আন্দাজ বরিশাল রওনা হবে। এখন নেমে তোমাদের একটা টেলিগ্রাম করতে ও এই চিঠি পোস্ট করতে যাচ্ছি। এ-সব কাজ স্টিমারের লোকেরাই করত, কিন্তু শহরটা একটু ঘুরে দেখার ইচ্ছা।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৪

বুধবার। সন্ধ্যা

বেলা দশটার মধ্যেই স্টিমার খুলনা ছেড়ে রওনা হল। এখন চলেছি মানুষের ঘরকন্নার সাথী ছবির মত ছোট নদী দিয়ে। দুই পাড়ে ধানক্ষেত। ধান কাটা শেষ হয়েছে। বাদামি রঙের ফাঁকা মাঠ; গোরু চরছে। মাঝে মাঝে চৌকো সরষেক্ষেত, হরিত-কপিশ— সব ফুল এখনো ফোটে নি। একটু পর-পরই লোকালয়; খোড়ো ঘর, ঢেউ-তোলা টিনের ঘর—আম, নারকেল, কলাগাছে ঘেরা। ক্বচিৎ একটা পাকা বাড়ি, সম্ভব জমিদারবাবুদের। স্নানের ঘাটে লোকের ভিড়; পাড়ের উপর ছাগলছানা লাফাচ্ছে। কোথাও নদীর ধারে হাটের জায়গা; বেড়াহীন ছোট ছোট টিনের চালা, গোটাকয়েক টিনের চাল টিনের বেড়ার ঘর— স্থায়ী দোকান ও মহাজনদের গুদাম। উজান-ভাটিতে নৌকা চলেছে নানা ধরনের— পাল তুলে, দাঁড় টেনে, লগি ঠেলে। পাড়ের উপর দিয়ে লোক-চলাচলের পথ; নানা বেশের লোক চলেছে—কারও মাথায় ছাতি, কারও

কাঁধে মোট। নদীর দুই পারে দূর দিয়ে চলেছে শ্যামল গাছের সার। এ নদীর যারা নাম দিয়েছিল মধুমতী, তাদের রুচির প্রশংসা করতে হয়।

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে গেল। স্নানের ঘাট সব খালি হয়ে এসেছে। এক-এক জন লোক তাড়াতাড়ি এসে চট করে দুটো ডুব দিয়ে তখনই উঠে যাচ্ছে।

আমাদের সারেং রহমত আলির নৌকা চাপা দেবার ভয় অত্যন্ত বেশি। বোধ হয় কোনোদিন ও কাজ করে বিপদে পড়েছিল। কিন্তু খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে। বেলা যখন দুটো, আর স্টিমার এসেছে কালিয়া গ্রামের কাছাকাছি, তখন স্টিমারের বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের সঙ্গে একখানা বড় পাট-বোঝাই নৌকার একটা মৃদু-রকম ঠোকাঠুকি হল। ফলে নৌকাখানি হল কিঞ্চিৎ জখম, তবে বেশি কিছু নয়। দোষ কাকেও বড় দেওয়া যায় না। দুই ফ্ল্যাট-সমেত আমাদের স্টিমারের এই ছোট নদীতে ঘোরাফেরা একটু সময়সাধ্য, আর জোর বাতাস থাকাতে চেষ্টা করেও নৌকাখানা সময়মত সরে যেতে পারে নি। এরকম ঘটনা ঘটলে সারেংকে

নিকটবর্তী পুলিশ-থানায় রিপোর্ট পাঠাতে হয়। স্টিমারের লোকজনদের মধ্যে অনেক জেলার লোক ছিল—চাটগাঁ, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিং। দেখলুম সকলে একমত যে, এ অঞ্চলের লোক বড় সহজ নয়; তিলকে তাল করে তোলার মত কল্পনার জোর নাকি এদের প্রচুর আছে। সারেঙের ইচ্ছা, তার রিপোর্টটা ইংরেজিতে লেখা হয়। স্টিমারে চলনসই ইংরেজি লেখকের অভাব, সুতরাং ঘটনার রিপোর্টটা লিখে দিতে হল। কালিয়া স্টেশনে স্টিমার থামিয়ে স্টেশনমাস্টারবাবুকে সেই রিপোর্ট দেওয়া হল থানায় পাঠিয়ে দেবার জন্য। তাঁর মুখে শুনলুম, এখানে ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছে যে, স্টিমার একখানা পাঁচ-শ-মণী বোঝাই নৌকা চাপা দিয়ে একবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। কালিয়া ছাড়বার অল্পক্ষণ পরে স্টিমারের কেরানিবাবু এলেন একটা লেখার খসড়া নিয়ে। তিনি নাকি স্টিমারে নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি; এরকম ঘটনার একটা রিপোর্ট তাঁকেও লিখে রাখতে হয়। যা লিখেছেন তা তাঁর মনঃপূত হচ্ছে না। লেখার উপর চোখ বুলিয়েই কারণটা

বুঝলুম। সেটা আমার লেখা সারেঙের রিপোর্টের হুবহু নকল। কি করা যায়— ওকেই অদল-বদল করে নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তির রিপোর্ট করে দেওয়া গেল।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৪
বৃহস্পতিবার
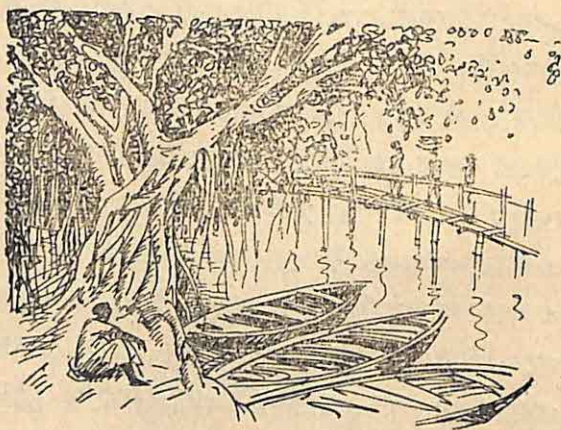
খুলনা ছাড়িয়ে এখন বরিশাল জেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আজ ভোর থেকেই নদীর দুই পাড়ে নারকেল-সুপারির সার চলেছে অবিচ্ছেদে। কিন্তু নদীর চেহারা গেছে বদলে। দুই পাড়ের সুস্পষ্ট সীমারেখার মধ্যে বহতা নদীর যে সুষমা এ নদীর তা নেই। খুলনার নদীর চেয়ে এ নদী প্রশস্ততর, কিন্তু এর দুই পাড়ই ঢালু, আর সে পাড় বালুর নয়, কাদার। নদীতে স্নানের ঘাট বড় দেখছি নে। গ্রামগুলি সব নদীর থেকে দূরে দূরে। কালকের খুলনার নদী ছিল তরুণী কলহাসিনী গৃহলক্ষ্মী, আর এ যেন ঈষৎস্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া গৃহিণী— সিঁথিতে সিন্দূর, পরনে চওড়াপাড় শাড়ি, কিন্তু কপোলে কপালে কর্কশ বলিরেখা দেখা দিয়েছে।

আমাদের সারেঙের মতে বরিশালের লোকের মত সুখী লোক কোথাও নেই। এদের সকলেরই যথেষ্ট ধানের জমি আর নারকেলের বাগান আছে, যাতে ধান ও নারকেল ফলে অসম্ভব রকম। এদের

নাকি ধারকর্জ নেই। আর প্রায় সকলের বাড়ির কাছ দিয়েই নদী কি নালা গিয়েছে, তাতে মাছের যেমন ভাবনা নেই, যাতায়াতেরও তেমনি সুবিধে। যে বাড়ির পাশ দিয়ে নদী কি নালা যায় নি সে বাড়িতে নাকি লোকে সহজে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। এই সঙ্গে সারেং আরও একটা খবর জানালে। খুলনার মেয়েরা নাকি লঙ্কামরিচ বাঁটে না ; তাদের রান্না যে কি ক'রে হয় তা রহমত আলির বুদ্ধির অতীত।

আমাদের এ স্টিমার সব স্টেশনে থামে না ; যেখানকার মাল আছে কেবল সেখানেই থামে। আর এক শ মণের চেয়ে কম হলে সে স্টেশনের মাল এ স্টিমারে বোঝাই হয় নি। কিন্তু যে স্টেশনে থামছে সেখানেই দেরি হচ্ছে অনেক। কারণ স্টিমারকে স্টেশনে ভিড়তে হচ্ছে আগে ফ্ল্যাট-দুখানি মাঝ-নদীতে খুলে রেখে ; আবার যাবার মুখে ও-দুখানিকে দু পাশে বেঁধে নিতে হচ্ছে। এই-রকম কসরত করতে করতে বেলা দশটার পর পৌঁছলুম হুলার হাট স্টেশনে। স্টেশনটি একটু বড় এবং এর মালও আমাদের স্টিমারে আছে যথেষ্ট।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৪
বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যা

সাড়ে-তিনশ মণ মাল নামিয়ে হুলার হাট ছাড়তে বেলা বারোটা বেজে গেল। বেলা প্রায় দেড়টার সময় পৌঁছলুম কাউখালি ব'লে এক স্টেশনে। ছোট স্টেশন, মালও নামল অল্প। আর সৌভাগ্যক্রমে এবারে ফ্ল্যাট নিয়েই স্টিমার পাড়ে লাগতে পারল। ভাবলুম কাউখালি ছেড়ে রওনা হতে দেরি হবে না। এমন সময় সারেঙের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এক ছোকরা জানালে যে, স্টিমার এখন এইখানেই নোঙর করে থাকবে যতক্ষণ না ভাটা আরম্ভ হয় আর খুলনাগামী বরিশাল এক্স্প্রেস্ স্টিমার পাস্ না করে—অর্থাৎ রাত প্রায় সাড়ে আটটায়। সারেং এসেও সেই খবর দিল। এখান থেকে বরিশাল যেতে, কতক দূর যেতে হয় একটা সরু খাল দিয়ে। সেইজন্য নিয়ম যে, ফ্ল্যাটগ্রস্ত স্টিমারগুলি বরিশালের দিকে যাবে ভাটার সময়, আর বরিশাল থেকে আসবে যখন জোয়ার।

কাউখালির স্টেশনমাস্টারবাবু দেখা করতে

এলেন। পরিচয় দিলেন তিনি আমার স্বজাতি। অবশ্য সারেঙের কাছে উপাধি-সমেত আমার নামটা শুনেছেন। তাঁর বাড়ি এই জেলাতেই ঝালকাটির কাছে; গ্রামের নামটা ভুলে গেছি। এখানে পাঁচ বছর আছেন। স্টেশনের লাগ কোয়ার্টার্স, গোল-পাতার ঘর। কাছেই একটা বন্দর, স্টিমার থেকে দেখা যায়। কাছাকাছি লোকজন অনেক আছে। কিন্তু এ জায়গায় নাকি খাবার জিনিসের ভারি অসুবিধা। বাঙালির খাবার দুধ আর মাছ; তা এ নদীতে মাছ বেশি পাওয়া যায় না; আর দুধের সের যখন অন্য সব জায়গায় পাঁচ-ছ পয়সা তখন এখানে, ঠিক কত বললেন মনে নেই, তবে তিন আনার কাছাকাছি একটা মারাত্মক সংখ্যা। নেমে গিয়ে চারটে ডাব পাঠিয়ে দিলেন। একটা খেয়ে দেখলুম অতি চমৎকার মিষ্টি জল। রোজা ভাঙার পর শরীর ঠাণ্ডা করবার জন্য সারেংকে একটা দিলুম। সে বলছে তার মন ভালো নেই। তিনজন খালাসির জ্বর, একজনের হাতে চোট লেগেছে। শর্ট হ্যাণ্ডে কাজ চালাতে হচ্ছে। বোধ হয় কালকের কালিয়ার

কাছের ব্যাপারটারও মন খারাপের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক আছে।

স্টেশনের কিছু পুবে পশ্চিম-মুখ হয়ে স্টিমার নোঙর করল। এই নদীর নাম কাউখালির খাল। বয়ে যাচ্ছে এখানে পুবে-পশ্চিমে। অল্পদূর পুবে নদীটি দুভাগ হয়ে এক ধারা গেছে উত্তরে বানরি-পাড়ার দিকে, আর দক্ষিণের সরু ধারাটি পার হয়ে আমরা যাব বরিশাল। ডাইনে সুপারি-নারকেলের দেয়ালে ঘেরা অর্ধচন্দ্রাকৃতি দুটি ধানক্ষেত। সব ধান কাটা হয় নি, বোধ হয় শুকিয়ে গেছে ; কেমন একটা শুষ্ক নিষ্ফল চেহারা। বানরিপাড়ার বাঁকের কাছটিতে গাছপালাগুলি ঝুঁকে প'ড়ে নদীর আয়নায় মুখ দেখছে। তার উলটো দিকে নদীর ঠিক পাড়ের উপরেই একটা বড় সুপারি-বাগান। নদীর ধার দিয়েই রাস্তা, বোধ হয় যাচ্ছে বন্দরের দিকে। বড় বড় নৌকা গুণ টেনে চলেছে সেই রাস্তা দিয়ে।

সূর্য পশ্চিমে ঢলতে আরম্ভ করেছে। ডেক রৌদ্রে ভরা। সামনের নদীর জল গলানো সোনা, চোখ ঝলসে যায়।

বেলা পড়তে শুরু হল। নদীর পাড়ের রাস্তাটি দিয়ে লোকচলাচল আরম্ভ হয়েছে। খানিকটা ফাঁকা জায়গাতে অনেকগুলি ছেলে জুটে হাডু-ডু খেলছে। ছোট ছেলেদের এক দল, আর তার চেয়ে বড়দের এক দল। তাদের চেয়ে বড় চার-পাঁচটি ছেলে খেলছে না; নানা রঙের র‍্যাপার গায়ে, দাঁড়িয়ে গল্প করছে ও খেলা দেখছে। এরা সম্ভব মাতব্বর বনে গেছে।

সুপারি-নারকেল-বনের ওপারে সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিম-আকাশে আর নদীর জলে গোলাপি আভা। ক্রমে সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসছে। উত্তর-পারে খান-চারেক বড় নৌকা এক সার বেঁধে নোঙর করল। দক্ষিণের রাস্তায় একজন একটা হ্যাসাক জ্বালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বন্দর থেকে বোধ হয় গ্রামের দিকে। আমাদের স্টিমারের পিছনের ডেকে নমাজের আজান দিচ্ছে। চার দিক ক্রমে স্তব্ধ অন্ধকার হয়ে এল। কেবল মাঝে মাঝে নৌকার দাঁড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৪

শুক্রবার

কাল রাতে এক্স্প্রেস্ স্টিমার চলে গেলে রাত দশটায় আমাদের স্টিমার নোঙর তুলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু কয়েক শ গজ গিয়েই বানরি-পাড়ার বাঁকের মুখটার অল্প দূরে আবার নোঙর করল। কুয়াশায় সার্চলাইট খেলছে না। সেখানেই সারা রাত কাটল, সকালটাও কেটে যাচ্ছে। কারণ বরিশাল-খুলনা মেল স্টিমার পাস না করলে যাবার জো নেই। সে স্টিমার এখানে পৌঁছবার কথা সকাল নটায়, কিন্তু দশটা বেজে গেলেও তার দেখা নেই। খুলনা থেকে বরিশাল এক্স্প্রেস্ স্টিমার এখান দিয়ে রাত তিনটেয় যাওয়ার কথা, গেল বেলা প্রায় নটায়। কুয়াশার খেলা। 'আলোরে যে লোপ করে খায় সেই কুয়াশা সর্বনেশে'।

বাটলার, উপেন আর স্টিমারের কেরানিবাবু নৌকা করে কাউখালি স্টেশনের বাজারে গেল মাছ কিনতে। স্টিমার যেখানে নোঙর করে আছে তার কাছেই বাজার। সূর্যোদয়ের কিছু পর থেকেই বহু

ছোট নৌকা বাজারের দিকে চলেছে পসরা নিয়ে। তরি-তরকারির নৌকা, বোধ হয় অল্প মাছের নৌকা, আর বেশির ভাগ নৌকার জিনিস হচ্ছে ধান ও খেজুরের রস। খেজুরের রস নৌকা করে স্টিমারেও বিক্রি করতে এনেছে।

বাটলার ও উপেন মাছ কিনে ফিরল। একটা ছোট রুই মাছ ও একটা ইলিশ মাছ এনেছে। মাছ নাকি বাজারে বেশি নেই। কাউখালির স্টেশন-মাস্টারবাবু কালই সে অভিযোগ করেছিলেন।

সাড়ে দশটা পর্যন্ত মেল স্টিমারের জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে বেলা এগারোটায় আমাদের স্টিমার সরু খালটিতে ঢুকল। খালের নাম বারুনী কি বারণী তা নোয়াখালি জেলার সারেং ও চাটগাঁ জেলার তার অ্যাসিস্ট্যাণ্টের উচ্চারণে ঠিক বোঝা গেল না। যা হোক, ফ্ল্যাট-সমেত স্টিমারের পক্ষে খাল যে বারণী তাতে সন্দেহ নেই। খালে ঢুকেই এতে চলাফেরায় এত বিধি-নিষেধের কারণ বোঝা গেল। খালটি এত সরু যে ছু-ফ্ল্যাট-সুদ্ধ আমাদের স্টিমার তার প্রায় সবটাই জুড়ে চলেছে। খালে ঢোকার অল্প পরেই

খুলনা-যাত্রী মেল স্টিমারের সঙ্গে দেখা। আমাদের স্টিমার দাঁড় করিয়ে কোনো গতিকে তাকে পথ দেওয়া হল।

লোকালয়ের ভিতর দিয়ে খালটি বেঁকে বেঁকে চলেছে। বরিশালের সব জায়গার মতো দু ধারে নারকেল খেজুর সুপারির বন। ঘরের চালে লাউ-এর লতা, আশেপাশে কলাগাছ। খাল থেকে সরু সরু সব নালা বেরিয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে গেছে। তাদের উপর বাঁশের বাঁকানো উঁচু সাঁকো, ক্বচিৎ কাঠের পুল।

খাল যখন এসে বড় নদীতে পড়ল তখন বেলা প্রায় একটা। সেই বড় নদীর একরকম মুখেই ঝালকাটির স্টেশন ও বন্দর। এই ঝালকাটি স্বদেশীর যুগে যে খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল তা সম্ভব মনে আছে। ফ্ল্যাট দুখানি খুলে রেখে স্টেশনে

লাগতে লাগতে প্রায় দুটো বাজল। এ স্টিমার বরিশাল পৌঁছতে রাত প্রায় নটা-দশটা হবে। বরিশাল থেকে এক্স্‌প্রেস্‌ স্টিমার ছেড়ে আসে সন্ধ্যা ছটায়। সুতরাং এবার আমার বরিশাল-দর্শন বরিশালের সৌভাগ্যে হল না। ঝালকাটিতেই নেমে পড়া গেল। বরিশাল থেকে খুলনা এক্স্‌প্রেস্‌ স্টিমার এখানে রাত আটটায় পৌঁছবে। ততক্ষণ ঝালকাটিতেই অপেক্ষা করব।

স্টিমারের লোকের ও স্টেশনের লোকের উপদেশে এখানকার ডাকবাংলায় এসে উঠেছি। সারেং ও স্টিমারের পাঁচ-ছজন খালাসি সঙ্গে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। এখানকার স্টিমার-আপিসের লোকেরাও খোঁজ-খবর নিচ্ছে। এইমাত্র একজন মুসলমান কর্মচারী ডাকবাংলায় এসে জিজ্ঞাসা করে গেলেন, কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কি না, এবং ব'লে গেলেন সময়মত আমার জিনিসপত্র নিতে লোক পাঠিয়ে দেবেন, আমি যেন কোনো চিন্তা না করি।

ডাকবাংলাটি স্টিমার-ঘাট থেকে বেশি দূর নয়। দু কামরা টিনের ঘর, বাঁশের সিলিং ও বেড়া। মেঝে

সিমেণ্ট করা। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে এই চিঠি লিখছি। সামনে রাস্তার ওপারেই একটা বড় ধানক্ষেত। ধান পেকেছে, এখনো কাটা হয় নি। তার পর নদী। নৌকার চলমান পাল দেখা যাচ্ছে। ওপারের সুপারি-নারকেল-বনের নীচ দিয়ে চলন্ত বড় নৌকার ছই দেখতে পাচ্ছি। উত্তর দিকটায় নদীর জল অনেকটা দেখা যাচ্ছে— রৌদ্রে গলা ইস্পাতের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। তার এক পাশে স্টেশনের ফ্ল্যাটের কুশ্রী দেহটা।

ডাকবাংলার সামনের ছোট মাঠটায় দুটি খঞ্জন নেচে বেড়াচ্ছে। রোগা একটা বাছুর ঘাস খাচ্ছে। সামনে রাস্তার পাশে চারটে ঝাউ গাছ। একটার গা ঘেঁষে এক খেজুরগাছ; হাঁড়ি বাঁধা রয়েছে। একটা কাক হাঁড়ির মুখে গলা ঢুকিয়ে রসাকর্ষণের বৃথা চেষ্টা করছে। ডাকবাংলার উত্তর ঘেঁষে এক ঘোলা জলের ডোবা। তার ওপারে মিউনিসিপ্যাল আপিস, তার পর পুলিসের থানা। তার পরে বাজারের সব টিনের চাল দেখা যাচ্ছে। ছ দিন জল-প্রবাসের পর ডাঙার জীবের ডাঙা মন্দ লাগছে না।

মূলতানি স্টিমার
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৫
সন্ধ্যা

এবারে কাল যখন স্টিমার ঝালকাটি পৌঁছল তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়েছে। দুখানা ফ্ল্যাটের এক-খানাকে এখানেই খুলে রাখা হল; ওতে নাকি কাছাড়ের মাল আছে, অন্য স্টিমারে টেনে নিয়ে যাবে। আমাদের এ স্টিমার কলকাতা থেকে বরাবর কোথাও না-থেমে এসেছে; কেবল খুলনাতে আড়কাঠী তুলে নেবার জন্য নদীর মধ্যেই অল্পক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আমার বাটলারের এবং স্টিমারের লোকজনদের কাঁচা রসদের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে। সুতরাং তা সংগ্রহের চেষ্টায় ঝালকাটিতে স্টিমার লাগানো হল। এ অসময়ে তরিতরকারি কিছু পাওয়া গেল না। বাটলার মাছ ও মুগের ডাল কিনে আনল। পথে আমার খাদ্য সংগ্রহের জন্য স্টিমার-কোম্পানি কিছু-কিঞ্চিৎ অবশ্য বাটলারের হাতে দিয়েছিল। সেটাকে উপেক্ষা ক'রে বাটলারের নামবার সময় সে জন্য তাকে কিছু দিয়ে দিয়েছিলুম।

মনে হচ্ছে বুড়ো বাটলারের কর্মে উৎসাহ ও সেলামের বহর দু-ই বেড়েছে।

ফ্ল্যাট খোলার জন্য আমাদের স্টিমার যেখানে থেমেছিল সেখানে 'মরভি' নামে একখানা স্টিমার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। আমাদের সারেং ডাকাডাকি করে তথ্য সংগ্রহ করলে যে, সে স্টিমার চাঁদপুর হয়ে ঢাকা যাবে। আমাদের এ স্টিমারে গুটি-পনেরো-ষোলো যাত্রী আছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন যাবে চাঁদপুর। মরভি স্টিমারের সারেঙের সঙ্গে কথা ব'লে চাঁদপুর-যাত্রীদের ঐ স্টিমারে তুলে দেওয়া হল। বন্দোবস্তটি সম্ভব ঘরোয়া; স্টিমার-কোম্পানির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই।

এবারেও এখন রোজা চলছে। এই যাত্রীরা দিনের উপবাসের পর সন্ধ্যায় নমাজের শেষে কোনোদিন চিঁড়েভিজা, কোনোদিন ছোলাভাজা দিয়ে রোজা ভাঙে। রাত একটু হতে-না-হতেই খাওয়া শেষ করে—ভাত, ডাল, একটা কিছু ভাজা কি তরকারি। সকলে সার দিয়ে ব'সে যায়, একজন

পরিবেশন করে। রাত একটু গভীর হলেই সমবেত কণ্ঠে ধর্মসংগীত গাওয়া হয়। গানের মধ্যে 'আল্লা রসুল' এই কথাটা মাত্র ধরতে পেরেছি। কাল আর গান হল না; বোধ হয় মূল গায়েন চাঁদপুরের যাত্রী ছিল।

স্টিমার বরিশাল পৌঁছেছিল রাত প্রায় বারোটায়, আজ ভোরে সারেঙের মুখে শুনলুম। সেখানে স্টিমার বাঁধে নি। সারেং নবাব আলির বাড়ি চট্টগ্রাম, খাস শহর চট্টগ্রামে। এ কথা নবাব আলি একটু গর্বের সঙ্গে প্রথম দিনই আমাকে জানিয়ে-ছিল। স্টিমারে আর যারা সব চট্টগ্রামের লোক আছে তাদের কারও বাড়ি শহরে নয়, শহর থেকে অন্তত বিশ-পঁচিশ মাইল দূর দূর। নবাব আলি লোকটির বয়স বছর-পঞ্চাশ হবে। বেশ গোলগাল চেহারা। খাবার হজম হয়, এবং অধিকাংশ খাদ্যকে চর্বিতে পরিণত করার রাসায়নিক ব্যবস্থা শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

বরিশাল ছাড়িয়ে কিছু পরেই কুয়াশার জন্য স্টিমার নোঙর করে রাখতে হয়েছিল। সকালেও এমন ঘন কুয়াশা ছিল যে, বেলা প্রায় আটটার

আগে স্টিমার রওনা হতে পারে নি।

দুপুরের আগে থেকেই নদী প্রশস্ত হতে আরম্ভ করেছে। দুপুর যখন গড়িয়ে গেল তখন নদী বেশ চওড়া, আকাশের অনেকখানির ছায়া জলের মধ্যে পড়েছে। খুলনা-বরিশালের মানুষের ঘর-গৃহস্থালির সঙ্গে মিশে-থাকা ছোট সব নদী ছাড়িয়ে এসেছি ; এ নদীতে উদার পদ্মার মুক্তির ডাক এসে পৌঁছেছে। এক পাড় উঁচু, ভাঙন-ধরা। মাঝে মাঝে ছোট-বড় চর। সেখানে কলাগাছ-ঘেরা মানুষের বসতি। যেতে যেতে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে সব নদী বেরিয়ে চলেছে ; নৌকার পালে অনেক দূর পর্যন্ত তাদের গতিপথ বোঝা যাচ্ছে। নদীতে ভারী হালকা বহু রকমের নৌকা। এক-একখানা ছোট নৌকার গড়নে ছবির রেখার সুষমা। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড সব ফ্ল্যাট টেনে স্টিমার চলেছে। ক্বচিৎ একখানা প্যাসেঞ্জার স্টিমার।

বেলা তিনটেয় স্টিমার মাদারিপুর ছাড়াল। নদী থেকে দেখা গেল, ঢেউ-তোলা টিনের ঘর ও অল্প গুটিকয়েক পাকা বাড়ির সমষ্টি।

বরিশাল এক-ফসলের দেশ। ধান কাটা শেষ হয়েছে, কাজেই নদীর পাড়ের মাঠ সব ফাঁকা, কেবল সুপারি-নারকেলের শ্যামলতায় প্রসন্ন। মাদারিপুরের পর থেকে নদীর পাড় বিচিত্র। একটু পরে পরেই হলদে সবুজ সরষেক্ষেতের সার চলেছে। মাঝে মাঝে অল্প আকের চাষ। আর তিসির ক্ষেতের চিকন ঘন সবুজে চোখ জুড়িয়ে যায়। কাছে দূরে সব গ্রাম, আম জাম ও বাঁশের কুঞ্জে ঢাকা।

বিকেল বেলা স্টিমারের কেরানি এলেন আমার টিকিটের পরিচয় তাঁর খাতায় টুকে নিতে। বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক, কৃষ্ণলেশহীন শুভ্র দীর্ঘ শ্মশ্রু; রোমান সেনেটারের চেহারা। তেত্রিশ বছর স্টিমার-কোম্পানির কেরানিগিরি করছেন। বাড়ি সিরাজগঞ্জ। ভদ্রলোকটির একটু আইনের পরামর্শ দরকার। বাড়ির কাছে একখানি জমি কিনেছেন। এখন প্রকাশ হচ্ছে যে, সাধু বিক্রেতাটি ও-জমি ও অন্য জমি পূর্বেই একজনের কাছে রেহান দিয়েছিল, আর সে কথা ফাঁস না ক'রে ভদ্রলোককে ও অন্যান্য লোককে সেই রেহানি জমিগুলি বিক্রি করেছে।

এখন রেহানদার রেহানি দলিলটি ভদ্রলোকের কাছে বিক্রি করতে রাজি আছে, তাঁর কেনা উচিত কি না এবং কিনলে কিরকম নালিশ রুজু করতে হবে। ব্যাপারটি কিছুই অসাধারণ নয় ; এ রকম হামেশা ঘটছে। ভদ্রলোককে তাঁর করণীয় সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া গেল।

আটটা বেজে গেছে, আমার খাবার তৈরি। এ রাত্রে স্টিমার যখন পদ্মায় পড়বে তখন সম্ভব ঘুমিয়ে থাকব। আর যদি জাগি-ও, অন্ধকারে কিছু দেখা যাবে না। আজ অমাবস্যা।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৫
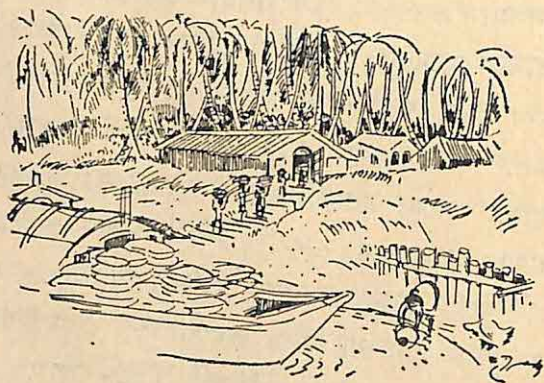
খুব ভোরে কেবিন থেকে বেরিয়েই পদ্মার সঙ্গে চোখাচোখি হল। আকাশ নীলাভ ধূসর, পুবে অল্প লাল রং; ভোরের অস্পষ্ট আলোতে তার সমস্তটার ছায়া পদ্মার জলের উপর রহস্যের যবনিকার মতো কাঁপছে। স্টিমার ডান পাড় ঘেঁষে চলেছে; বাঁয়ে চক্রাকারে শীতের পদ্মার প্রশান্ত বিস্তার, বহুদূরের তরুশ্রেণীর আবছায়া কালো রেখায় সীমানা টানা। কুয়াশা প্রায় নেই। নৌকার চলাচল আরম্ভ হয়েছে। সামনে কিছু দূরে একখানা নোঙর-করা স্টিমার দেখা যাচ্ছে।

সূর্যোদয়ের পর থেকেই কিছু কিছু কুয়াশা জমতে আরম্ভ করেছে। বেলা সাতটার পর সাদা কুয়াশা এতটা ঘন হয়ে এল যে, বাঁ পাড়ে একটা জায়গায় স্টিমার বাঁধতে হল। উঁচু পাড়। সামনেই একটা ছোট বসতি। খান সাত-আটেক খড়ের ঘর; দুখানা টিনের। কয়েকটা খড়ের গাদা। গোটা-দশেক গোরু গোল হয়ে খুব নিবিষ্টমনে জাব খাচ্ছে। নদী আর বসতির মাঝের জমিটুকুতে দুটি কলাঝোপ,

ছোট একখানি সরষেক্ষেত, আর অল্প গোটা-কয়েক তামাকের চারা। কয়েকজন ছেলেমেয়ে ও দু-তিনটি বয়স্ক লোক স্টিমার দেখতে দাঁড়িয়ে গেল, যদিও স্টিমারের যাতায়াত এখানকার নিত্য বহুবারের ঘটনা।

স্টিমারের পাশ দিয়ে ক্রমাগত জেলে-নৌকা চলেছে। স্টিমারের লোকেরা মাছ কেনার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। 'হালদার', 'মশায়' প্রভৃতি অনেক সম্মানের সম্বোধনে জেলেদের ডাকা হল; কিন্তু মাছ কারও নৌকাতেই নেই, তারা সবে মাছ ধরতে বেরিয়েছে। হালের কাছে এক-একজন জেলের আত্মসমাহিত গম্ভীর মুখ দেখে, সেক্‌স্‌পীয়রের কোন্ একটা সংস্করণে 'কোরিয়লেনাস'এর এক ছবি দেখেছিলাম, তাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

বেলা আন্দাজ নটায় কুয়াশা কেটে গেলে স্টিমার চলতে শুরু করল। দু পাশে দূরে কাছে অসংখ্য নৌকা চলেছে—জেলে-ডিঙি, যাত্রীর নৌকা, বোঝাই কিস্তি। দুতিনখানা নামজানা যাত্রী-স্টিমার বেগে বিপরীত দিকে চলে গেল।

মাঝে মাঝেই লম্বা নীচু কাঁচি চর জলের উপর ভেসে উঠেছে। কতক বালু ভেজা, ধূসর, কতক সাদা ধবধবে— ভোরের রৌদ্রে চিকচিক করছে। অল্প পরেই গোয়ালন্দের স্টিমার-ঘাট দেখা গেল। স্টিমারের সার তিন-চার থাকে ঘাটে লেগে আছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে ধোঁয়া উঠছে। বড় বড় ফ্ল্যাট মাঝ-নদীতে ছেড়ে দেওয়া। এক পাশে নৌকার সার। পাড়ের উপর গোয়ালন্দ-চরের বাজারের হালকা ছাউনি ও ততোধিক হালকা বেড়ার দোকানঘর; আর সেই রকমেরই রেলের টিকিট আপিস ও পোস্ট-টেলিগ্রাফ আপিস—বাবুদের কোয়ার্টার্স-সমেত।

নেয়ে খেয়ে স্টিমার থেকে নামার সময় বাটলার মৌলা বক্স অনুনয় জানালে যে, মাছ-তরকারি কেনার পয়সা যে আমি দিয়েছি এটা যেন স্টিমার-কোম্পানির কর্তৃপক্ষ না জানে। তাকে অভয় দিলুম।

'দোয়ারি' স্টিমার
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৬
শুক্রবার
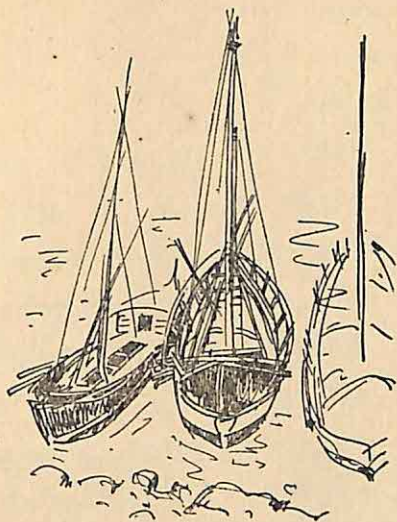
ঢাকা মেল ভোর পাঁচটায় গোয়ালন্দ পৌঁছল; অর্থাৎ তখনও ভোর হয় নি, বেশ অন্ধকার। নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের যাত্রীদের হাঁক-ডাক আরম্ভ হল, কিন্তু আমার তাড়া নেই। যদিও স্টিমার-কোম্পানির জগন্নাথ ঘাটের সাহেব জানিয়েছিল, তাদের যে স্টিমার ১৯শে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছে সুন্দরবন ঘুরে তার ২৩শে গোয়ালন্দ পৌঁছবার কথা, কিন্তু আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতুম, ২৪শে পর্যন্ত সে স্টিমার পৌঁছলেই মঙ্গল। সুতরাং পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করছি, এমন সময় তোমার চাকর অনন্ত নিজেকে রাস্তাঘাটে চটপটে প্রমাণ করার জন্য, আমি নেমে না ডাকতেই বিছানা বাঁধতে হাজির। তার এই অভূতপূর্ব কর্মপ্রবণতায় বাধা না দিয়ে উঠে পড়া গেল। বেশ ফরসা হলে গাড়ি থেকে নামব, এবং নেমে দিনটা এবং সম্ভব রাত ও তার পরদিন দুপুর পর্যন্ত কোথায় কাটাব

ভাবছি, এমন সময় দুটি টিকিট-চেকার ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন, একটি হিন্দু অন্যটি মুসলমান। টিকিট দেখানো গেল, কিন্তু তখনই বুঝলুম টিকিট দেখা একটা অছিলা মাত্র। মুসলমান ভদ্রলোকটি একটি খাজনার মোকদ্দমা প্রথম আদালতে হেরেছিলেন কিন্তু আপীলে জিতেছেন; প্রতিপক্ষ হাইকোর্ট করেছে। মোকদ্দমার হাইকোর্টে ফলাফল সম্বন্ধে আমার মতটা জানলে বাধিত হবেন। অবশ্য অনন্তের কাছে আমার ব্যবসায়ের পরিচয়টা সংগ্রহ হয়েছে। শুকনো ডাঙায় মাছ ও আরও একটা জিনিসের লোভ সামলানো কঠিন—কবিকঙ্কণ বলেছেন; উকিল দেখলে মোকদ্দমার পরামর্শ লিস্টে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে।

এঁদের কাছে জানলুম, গোয়ালন্দে দিন-রাত কাটাবার ও স্নানাহারের প্রশস্ত জায়গা হচ্ছে চাঁদপুর মেল স্টিমার। চাঁদপুরগামী স্টিমারখানি ঘাটে লেগেই আছে, বেলা একটার আগে ছাড়বে না। এবং সেখানি রওনা হবার অল্প সময়-মধ্যেই কলকাতাগামী চাটগাঁ মেলের যাত্রী নিয়ে চাঁদপুর

থেকে স্টিমার পৌঁছবে, এবং পরদিন বেলা একটায় ছাড়বে। নিশ্চিন্ত হয়ে বেলা সাতটা আন্দাজ চাঁদপুর মেল স্টিমারে গিয়ে ওঠা গেল। যে ফ্ল্যাট দিয়ে ওঠার পথ সেখানেই ঘাট-সুপারভাইজার বাবুর আপিস। তাঁর কাছে যেতেই তিনি অত্যন্ত ভদ্রতা দেখালেন এবং জানালেন, আমার আগমনবার্তা পূর্বেই হেড-আপিস থেকে পেয়েছেন। আমার স্টিমার 'দোয়ারি' এখনও পৌঁছয় নি। পৌঁছনোমাত্র আমাকে খবর দেবেন।

চাঁদপুর মেল স্টিমারগুলি, যা ঢাকা মেল স্টিমারও বটে, বেশ আরামের। এ স্টিমারখানির নাম 'গুর্খা'। দুপুরের খাবার অর্ডার দিয়ে স্টিমার থেকে নেমে পড়া গেল। অভিপ্রায়, মেঠো রাস্তা দিয়ে প্রাতর্ভ্রমণ ও কিঞ্চিৎ কবিত্ব করা। একটা রাস্তা ধরে অনেকটা দূর যাওয়া গেল, কিন্তু রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে দু-এক জায়গায় সরষে ফুল ফুটলেও চার দিকে কেমন একটা অগ্রাম্য নীরস ভাব। গোয়ালন্দের নদীর ধারের যাত্রী ও মাল-চলাচলের ক্ষিপ্র জীবন ও তার আনুষঙ্গিক

দরমার-বেড়া-দেওয়া টিনের চালের বাজার তার পিছনের গ্রাম্য প্রকৃতির রস শুষে নিয়েছে। বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে বাজারে ঢোকা গেল। অগ্রাম্য গ্রামের চেয়ে বাজারের জীবনচাঞ্চল্য অনেক ভালো। মনে হল একটি নাপিত পেলে নিজের হাতে কামানোর দায় থেকে একটা দিন রেহাই পাওয়া যেত। লুঙ্গিপরা চেকদার কোট গায়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম এখানে নাপিত পাওয়া যায় কি না। লোকটি বোধ হয় গোয়ালন্দের অধিবাসী; তার 'পেট্রিয়টিজ্‌মে' আঘাত লাগল। বিজ্ঞ তাচ্ছিল্যের ভাবে জানালে, গোয়ালন্দ শহরে আবার নাপিতের ভাবনা। একটা দিক দেখিয়ে বললে, সেদিকে অনেক নাপিত দেখতে পাব। গিয়ে দেখি দুজন নাপিত রয়েছে; একজন নিজ ব্যবসায়ের কাজে ব্যস্ত, অন্যটি যন্ত্রপাতি শানাচ্ছে। বেকার নাপিতটিকে স্টিমারে এনে ক্ষৌরি হওয়া গেল। লোকটির বাড়ি মুঙ্গের জেলায়, বাইশ বছর গোয়ালন্দে নাপিতি করছে। নাপিত-ভাবনা-হীন গোয়ালন্দ শহরে কোনো বাঙালি নাপিত চোখে পড়ে নি।

নেয়ে খেয়ে গুর্খা স্টিমারে ব'সে ব'সে গোয়ালন্দের শীতের পদ্মা দেখছি। সামনে একটা প্রকাণ্ড চর পড়েছে। ওপারের জল দেখা যাচ্ছে না, দূর-গাছের কালো রেখায় তার প্রসারটা অনুমান করছি। দুপুরবেলা স্টিমার-নৌকার চলাচল অনেকটা কম। ক্রমে গুর্খার ছাড়বার সময় হল; কলকাতা থেকে চাটগাঁ মেল এসে পৌঁছেছে। স্টিমার থেকে নেমে সুপারভাইজার বাবুর ফ্ল্যাটে মালপত্র রেখে, উপরে এক টুকরো ঘাসের জমি ছিল সেখানে আস্তানা করা গেল। চাঁদপুর থেকে স্টিমার পৌঁছল বেশ একটু দেরি করে। খুব ভিড়। সাদা সাহেব ও পোশাকি কালো সাহেবদের সংখ্যাও কম নয়। লোকজন নেমে গেলে ধীরে সুস্থে সে স্টিমারে ওঠা গেল। নাম 'এমু', অর্থ যা-ই হোক। কেবিনে মালপত্র রেখে সেখানেই রাত কাটাব স্টিমারের লোকজনদের জানাচ্ছি, এর মধ্যে সুপারভাইজার বাবুর লোক এসে খবর দিল, আমার স্টিমার দোয়ারি এসে ঘাটে লেগেছে এবং আমাকে নেবার জন্য তারা এখনই স্টিম-লঞ্চ আনছেন। একটু পরেই

'হাতি' নামধেয় লঞ্চ 'এমু'র পাশে এসে লাগল। এ লঞ্চখানিকে ইতিমধ্যে বহুবার উজান-ভাটি করতে দেখেছি। হাতি-আরোহণ যে আমার ভাগ্যেও ছিল তা তখন মনে করি নি। দু-চার মিনিটের মধ্যেই হাতি আমাকে দোয়ারিতে পৌঁছে দিলে। দূর অতি সামান্য, এর জন্য স্টিম-লঞ্চ আনবার কোনো দরকার ছিল না। স্টিমার-কোম্পানির অতিরিক্ত সৌজন্যে তাদের শুভকামনা না করে পারছি না। তাদের ব্যাবসা বর্ধিত হোক। যত কমে হয় তারা যেন এদেশী লোকদের খাটিয়ে নিতে পারে। এখানে ওখানে ছোটখাটো দেশী স্টিমার-কোম্পানি গড়ে উঠে তাদের মুনাফার অঙ্কে যেন ঘাটতি না ঘটায়।

২

দোয়ারি বেশ বড় স্টিমার। উঠে সামনের ডেকে আসতেই জানা গেল, আমার এ বাহনটি বড় কেউকেটা নয়। সেলুনের সামনে এক পিতলের ছোট প্লেট আঁটা, তাতে খোদা রয়েছে যে, যুদ্ধের সময়, ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল, এ স্টিমার

নিজের স্টিমে ('under her own steam') ৩৪২৬ মাইল চলে বসরা পৌঁছে টাইগ্রিস নদীতে 'rendered invaluable transport service' —সৈন্য ও মাল টানার অমূল্য কাজে নিজেকে লাগিয়েছিল; এবং যুদ্ধশেষে নিজ বাষ্পবলেই আবার কলকাতায় ফিরে আসে। সুতরাং যে সেলুনে বসে আমি খাচ্ছি ও লেখাপড়া করছি সার্জেন্ট-মেজর ও সেকেণ্ড্ লেফ্‌টেন্যান্ট্ প্রমুখ বীরেরা ছোট বড় 'পেগ' পার করে নিশ্চয়ই তাকে ধন্য করেছেন, এবং তাদের কেউ কেউ কুট্-আল-আমারায় তুর্কিদের হাতে ধরাও বোধ হয় পড়েছিলেন। স্টিমারটির উপর সম্ভ্রম জন্মাল।

বাটলার সাদের আলির বয়স কম, হাসিমুখ ও চটপটে। লোকটিকে দেখে খুশি হলুম। বাড়ি বিক্রমপুর। আসামে চা-কর সাহেবদের বাটলারি অনেক দিন করেছে। বছরখানেক নানা সাংসারিক গোলযোগে বাড়ি বসে ছিল। স্টিমার-কোম্পানির বাবুরা গোয়ালন্দ থেকে তাকে আমার জন্য জুটিয়েছেন, কারণ সে নাকি দেশী ও ইংলিশ খানা

তুইই রাঁধতে ওস্তাদ। পরীক্ষায় দেখছি সার্টিফিকেটটা ভুয়ো নয়। লোকটা রাঁধে ভালো। কোম্পানির এক বাবু এসে আমার তদ্‌বির করে গেলেন, এবং যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে স্টিমারের লোকদের সতর্ক করলেন।

চারটে-আন্দাজ বেলায় দোয়ারিতে উঠেই শুনলুম, স্টিমার এখনই ছাড়বে। ছাড়তে ছাড়তে হল সন্ধ্যা সাতটা। দুখানা ফ্ল্যাট দু দিকে বেঁধে রওনা হওয়া গেল। আশা ছিল ভূতপূর্ব তারিণীগঞ্জ স্টেশনের ঝাউগাছের সার, ও তেওতা ইস্কুলের নদীর ধারের বোর্ডিং দেখতে পাব। কিন্তু রওনা হওয়ার আগেই রাত্রি এসে গেল, চোখে আর কিছু পড়ল না।

৩

ভোরবেলা উঠে খবর নিয়ে জানলুম, আমাদের টাঙ্গাইল যাওয়ার স্টিমার-স্টেশন পোড়াবাড়ি ছাড়িয়ে এসেছি এবং সিরাজগঞ্জের দিকে চলেছি। আমাদের এ স্টিমার ফুলছড়ি ঘাটের আগে কোথাও

ভিড়বে না, কারণ তার পূর্বের কোনো জায়গার মাল এতে নেই, এবং এটা প্যাসেঞ্জার স্টিমার নয়। বেলা এগারোটায় সিরাজগঞ্জ ছাড়ালুম। শহর থেকে অনেক দূরে এক চরের নীচে স্টেশনের ফ্ল্যাট; চরের উপর কয়েকখানা মালগাড়ি রেল-স্টিমারের সংগম-স্থল ঘোষণা করছে। বিকাল তিনটের পর স্টিমার জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে একটু থামল, কোনো মাল দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে নয়, বোধ হয় নিজেকে রিপোর্ট করতে।

স্টিমারে একলা চলেছি; এ পর্যন্ত স্টিমারের বা দুই ফ্ল্যাটের বাবুদের কেউ আলাপ-পরিচয় করতে আসেন নি। কিন্তু একটু পরেই জানলুম তাঁদের মধ্যে গুনী লোকের অভাব নেই। সন্ধ্যার একটু আগে অনন্তের হাত দিয়ে আমাকে একটুকরো কাগজ পাঠিয়ে একটি ভদ্রলোক একটু সরে দাঁড়ালেন। কাগজখানি দেখলুম একটি বিজ্ঞাপন, লাল কালিতে ইংরেজি হরফে ছাপা। 'Very nice! Very nice!! Horbolla Sound'—'অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!! হরবোলার বোল'। এবং তার পর

বিড়াল, মুরগি, দাঁড়কাক, দুই বিড়ালের ঝগড়া, শেয়াল-কুকুরের কলহ প্রভৃতি দ্বাদশ দফার উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে 'that's all'—'এই শেষ'। নীচে নাম 'হেমেন্দ্রমোহন রায়, Sounder—শব্দোৎপাদক'। গ্রাম ও পোস্ট আপিস বিঝারি, জেলা ফরিদপুর।

এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে পরিচয় নিলুম। গোলগাল কালো চেহারা, মুখে পাকা-কাঁচা দাড়িগোঁফের খোঁচা, মাথায় একটি নাতিকৃশ টিকি, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। স্টিমারের ডাইনে যে ফ্ল্যাটখানি বাঁধা আছে তার কেরানি; ছাব্বিশ বছর স্টিমার-কোম্পানির কাজ করছেন। ঠিক হল, আগামী কাল সকালে, খৃস্টমাসের দিনে, হরবোলার বৈঠক বসবে।

রাত দুটোয় ফুলছড়ি ঘাটে স্টিমার পৌঁছল, এবং মালপত্র নামিয়ে উঠিয়ে ছাড়ল ভোর-রাত সাড়ে চারটেয়। লাগবার ডাকাডাকি ও ছাড়বার হাঁকাহাঁকিতে আমারও ঘুম ভেঙেছিল।

বৃহস্পতিবার সমস্ত দিন এসেছি শীতের যমুনার

পরিচিত রূপ দেখতে দেখতে। ভাঙন-ধরা উঁচু পাড়, কলাগাছ আমগাছে ঘেরা খোড়ো চালের বসতি ; সাদা বালুর নীচু চর রৌদ্রে ঝিক্ ঝিক্ করছে ; সাদা পাল তুলে, ক্বচিৎ রঙিন পালের, নৌকা চলেছে ; মাঝে মাঝে জেলে-ডিঙি। গোয়ালন্দের দিকে ছোট বড় স্টিমার যাচ্ছে, স-ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাটহীন। ব্রহ্মপুত্রের এ অংশকে আমাদের দেশে বলে যমুনা। একসময় এখান দিয়ে যমুনা নামে ছোট এক নদী ছিল, ব্রহ্মপুত্র চলত ভিন্ন ধারায় ময়মনসিংহ শহরের নীচ দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকালে কি-এক নৈসর্গিক বিপ্লবে ব্রহ্মপুত্রের মূলধারা নিজের পথ ছেড়ে এই যমুনার খাদ দিয়ে বহতা হল। ব্রহ্মপুত্রের পুরনো খাদ আজ হীনস্রোত। লাঙলবন্দের অষ্টমীস্নান তার পূর্ব-গৌরবের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে।

৪

আজ সকাল নটায় সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের পিছনে হাওয়া থেকে একটু আড়ালের জায়গায়

হরবোলার মজলিস বসল। স্টিমারের বাবু ও খালাসিদের অনেকে এবং ডেকযাত্রীদের প্রায় সকলেই উপস্থিত হল। কেবল এলেন না হেমেন্দ্র-বাবুর সহকর্মী তাঁর ফ্ল্যাটের বাবুরা কেউ। ঈর্ষা এমনি জিনিস! গায়ের র‍্যাপারে মাথা-মুখ ঢেকে দু-একটা বাদে বিজ্ঞাপনের লিস্ট-মাফিক সব ডাক হেমেন্দ্রবাবু আমাদের শোনালেন। প্রতি ডাকের প্রস্তাবনা করলেন ইংরেজি শব্দে বা ছোট ইংরেজি বাক্যে, এবং কেন জানি না, তার ব্যাখ্যা দিলেন হিন্দিতে, যদিও তার শ্রোতাদের সকলেই ছিল বাঙালি। বোধ হয় হেমেন্দ্রবাবু দূরদর্শী লোক, ভবিষ্যতের রাষ্ট্রভাষায় এখন থেকেই নিজেকে অভ্যস্ত করছেন। মজলিস ভাঙলে তাঁকে কেবিনে ডেকে এনে কিছু দক্ষিণা দিলুম; বললেন, টাকার জন্য কিছু নয়, শুনিয়েই তাঁর আনন্দ। একবারে খাঁটি গুণীর কথা। বাড়ির পরিচয় নিয়ে জানলুম, তাঁরা পাঁচ ভাই, চারজন নানা জায়গায় চাকরি করেন, একজন বাড়িতে থাকেন। চারটি মেয়ে, দুটি ছেলে। বড় ছেলেটির বয়স চোদ্দো,

ইস্কুলে পড়ে। একটি মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি। বাপ অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, কি সব মামলা-মোকদ্দমায় বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বললেন, সবই অদৃষ্ট। আমার কলকাতার ঠিকানাটা নিলেন। জানালেন, যদি কলকাতায় যান (তাঁর এক ভাই সেখানে চাকরি করে) তবে আমার বাড়ির ছেলেমেয়েদের একবার হরবোলার বোল শুনিয়ে আসবেন। বোধ হয় সন্দেহ হয়েছে, আমি হরবোলার ডাকের তেমন রসজ্ঞ শ্রোতা নই।

ফুলছড়ি ঘাটের পর থেকে ধুবড়ি পর্যন্ত আমাদের স্টিমার প্রতি স্টেশনে থেমে থেমে যাবে। কারণ, এই জায়গাটা চলাচলের রাজ্যে নন্-রেগুলেটেড প্রভিন্স। কোনো রেল নেই, এবং স্টিমার-সার্ভিস যা আছে তা আমাদের সময়কার 'সবুজপত্রে'র চেয়েও তারিখের শাসন কম মানে। আসাম-সুন্দরবন ডেস্প্যাচ্ সার্ভিসের অনিয়মগামী স্টিমারগুলিই (যা স্টিমার-কোম্পানির টাইম-টেবলের ভাষায় 'are not run to a timing'—কোনো নির্দিষ্ট সময় মাফিক চলে
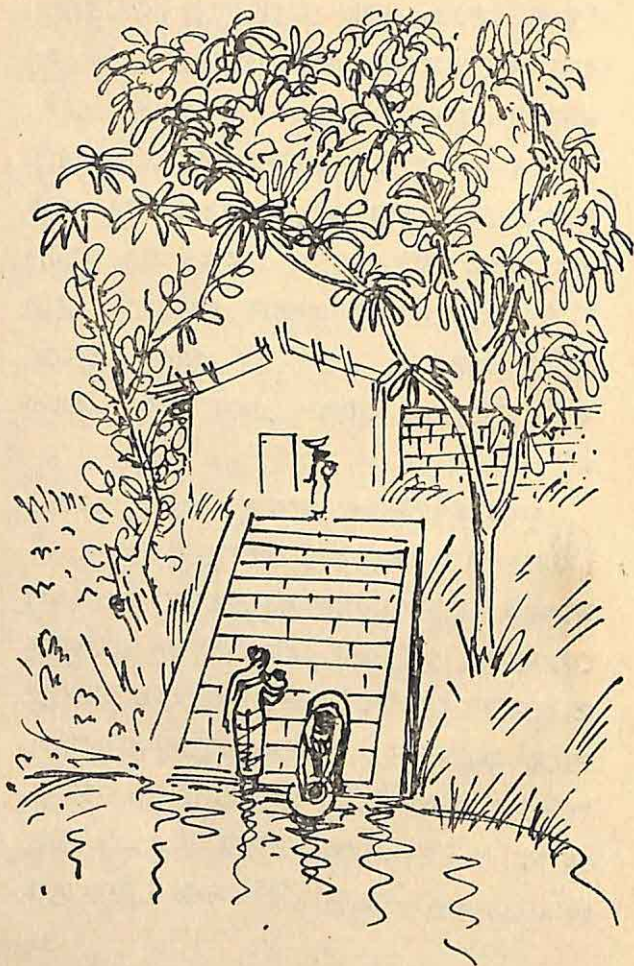
না) এখানকার দূর-গমনের একমাত্র বাহন। সেইজন্য এ স্টিমারগুলি উজান-ভাটিতে এ জায়গাটায় প্রতি স্টেশনে প্রায় থামে, মালও নেয়, লোকও নেয়। এবং কাপড়ের গাঁট, কেরোসিন তেলের টিন, রঙের ড্রাম, হালকা জাপানি মালের কাঠের বাক্স (দেখলুম একটা প্রকাণ্ড বাক্স একজন মুটেই স্টিমার থেকে নামাচ্ছে), লোহার শিক, তার, কড়াই, গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড্‌ বালতি প্রভৃতি সভ্যতার উপকরণ ব্রহ্মপুত্রের দুই কূলে ছড়িয়ে চলে।

বেলা একটায় চিলমারি এলুম। চিলমারির কাঁসা-পিতলের বাসন, বিশেষ এখানকার অতি সুডৌল গাড়ু, এক সময় বিখ্যাত ছিল। এখন কিছু নেই। চিলমারির বন্দরে এখন যে কারবার চলে সে শুধু পাট ও অন্য কৃষিবস্তু চালান দেবার। দেশ হয়তো industrialized হচ্ছে, কিন্তু বাংলার গ্রামগুলিকে আমরা খুব দ্রুতগতিতে বিশুদ্ধ agriculturize করছি। সঙ্গে যে দুই ফ্ল্যাট এসেছিল তার একখানিকে এখানে রেখে যাওয়া হল; ওতে পাট বোঝাই হয়ে চালান যাবে। চিলমারি থেকেই

গারো পাহাড়ের সার আকাশের সীমান্তে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে।

চিলমারি থেকে অল্প দূরে ব্রহ্মপুত্রের অন্য পারে রৌমারি স্টেশন। সেখানে পৌঁছতে হল ফ্ল্যাটখানি খুলে রেখে দুই চরের মাঝ দিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ধারায় অনেক দূর উজিয়ে গিয়ে। এখানে-ওখানে তার মধ্যে বহু নীচু কাঁচি চর। নদীর কালো জল ও চরের শুভ্র বালু পাশাপাশি অপরাহ্ণের রৌদ্রে অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি করেছে। একটু দূরে একটা চর প্রায় ঢেকে চখাচখির ঝাঁক বসেছে। তাদের ধূসর চঞ্চল পাখায় চরটি যেন কাঁপছে, মনে হয় পদ্মের পাতায় ঢাকা পদ্মবন। এক দিকের উঁচু কায়েম চরে একটা তাঁবু পড়েছে, অনেক লোক আনাগোনা করছে; নীচে একখানা বড় নৌকা বাঁধা। হাকিমের সফর না জমিদারবাবুর শিকার ঠিক বোঝা গেল না।

রাত প্রায় এগারোটায় স্টিমার যাত্রাপুর পৌঁছল। যাত্রাপুর রংপুর জেলায় এবং বাংলাদেশের শেষ স্টিমার-স্টেশন। এর পর থেকে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার এলাকা।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৬
রবিবার

শনিবার ভোর সাতটায় ধুবড়ি আসা গেল। ধুবড়ি গোয়ালপাড়া জেলার হেড কোয়ার্টার্স, এবং স্টিমার-লাইনের একটা অংশের হেড-আপিস। নদীর ধারে ধারে ছোটখাটো সুন্দর শহরটি। বছর-কয়েক পূর্বে এক মোকদ্দমায় ধুবড়ি এসে অনেকদিন ছিলুম, বোধ হয় মনে আছে। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের উপরে যে রাস্তা দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বেড়াতে যেতুম সে রাস্তার ধারে ফরেস্ট-আপিসের দোতলা টিনের বাংলো, এস্.ডি.ও.-র (যিনি এখানকার combined hand —একাধারে ম্যাজিস্ট্রেট, সবজজ, রেভিনিউ অফিসার) বাংলো, নদীর খাড়া পাড়ের উপর তিন দিক জলে ঘেরা, বেশ কবিত্বপূর্ণ কিন্তু একটু আশঙ্কা-জনক অবস্থিতির উকিল-লাইব্রেরি, ধুবড়ি ছাড়ার পথে স্টিমার থেকে সব দেখতে দেখতে গেলুম। ভিক্টোরিয়া-গার্ডেনের লাগাও নদীর ধারের যে বাংলোটিতে ছিলুম সেটি কিন্তু চোখে পড়ল না।

ধুবড়িতে স্টিমার প্রায় তিন ঘণ্টা দাঁড়াল।

স্টিমার থেকে লোকজন নেমে গেল বাজার করতে। আমার বাটলার একটা বড় কাতলা মাছ কিনে নিয়ে এল। অতি সুস্বাদু টাটকা মাছ। ধুবড়ি থেকে আমাদের স্টিমার চলল ফ্ল্যাট-বিনির্মুক্ত হয়ে। বাকি ফ্ল্যাটখানি হেমেন্দ্রবাবুকে নিয়ে এখানেই রয়ে গেল, এবং সম্ভব দু-একদিন থাকবে। আশা করি ধুবড়ি শহরে গুণজ্ঞ লোকের অভাব নেই।

ধুবড়ি ছাড়ার পর থেকে নদীর দুই ধারে পাহাড়ের সার দেখতে দেখতে এসেছি। ব্রহ্মপুত্রের মত প্রকাণ্ড নদীর মাঝ থেকে দুই তীরে এমন পাহাড়ের দৃশ্য পৃথিবীতে নাকি খুব কম দেখা যায়। গাছে-গুল্মে ঢাকা কৃষ্ণাভ সবুজ সব পাহাড়। নন্‌-কো-অপারেশনের সময় মহাত্মা যখন আসামে এসেছিলেন তখন এক অভিনন্দনের উত্তরে আসাম-বাসীদের বলেছিলেন, 'your bewitchingly beautiful country'—জাদুকারী সৌন্দর্যের দেশ তোমাদের। ব্রহ্মপুত্র ও তার দুই কূলে নীল পাহাড়ের এই সার দেখলে এ বর্ণনার যাথার্থ্য বোঝা যায়।

বিকাল তিনটেয় স্টিমার বিলাসীপাড়া এল। শীতের ব্রহ্মপুত্র নিস্তরঙ্গ, মনে হয় যেন স্থির। কেবল পূর্ব-বাংলার ধানক্ষেতের দিকে দ্রুতধাবমান কচুরি-পানার ছোট বড় ঝাড় তার অন্তরের গতিবেগ জানান দিচ্ছে। এই জলের উপর রৌদ্রের খেলা ও স্টিমারের সামনের ডেকের ছাদে তার আলো-ছায়ার কাঁপন-লীলা সারা দুপুর দেখতে দেখতে এসেছি। বিলাসীপাড়ার স্টেশন-ফ্ল্যাটের ঠিক পিছনেই এক সার পাহাড়, এবং বিলাসীপাড়ার পর অনেক পাহাড় নদীর বেশ কাছাকাছি। একটা তিন-চূড়া-ওয়ালা পাহাড়ের দিকে আমাদের স্টিমার এগিয়ে চলেছে। নদীর জলে তার অকম্পিত ছায়া বহুক্ষণ ধরে দেখছি, যেন কোনো মন্দিরের ছায়া।

স্টিমারের পিছনে সূর্যাস্ত হল। পশ্চিম-আকাশের সোনার রং নদীর এদিকের জল রাঙিয়ে রাখল অনেকক্ষণ।

রাত আটটায় স্টিমার গোয়ালপাড়া পৌঁছল।

২

আজ রবিবার সকাল থেকেই আকাশে মেঘ, নদীর উপর কুয়াশা এবং প্রচণ্ড শীত। সমস্ত দিন সূর্যের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি, কেবল দুপুরবেলার কাছাকাছি দু-চার মিনিটের জন্য এক ঝলক রোদ, আর বিকালে সূর্যাস্তের সময় পশ্চিম-আকাশের কালো মেঘে গলানো সোনার একটা চওড়া রেখা।

নদী ও তার পাড়ের দৃশ্যও বদলে গেছে। পাহাড় বড় চোখে পড়ছে না। নদীতে নৌকা বিরল, এবং দক্ষিণের যে উঁচু পাড়ের কাছ ঘেঁষে প্রায় সারা দিন স্টিমার চলেছে তাতে লোকালয় খুব কম। কেমন একরকম শুকনো চেহারার লম্বা ঘাস সে পাড়ের উপর। আকাশের ধূসর মেঘে ঢেউশূন্য ঘোলাটে নদী। মনটা দমে গেল। সারা দুপুর একটামাত্র জানলা খোলা রেখে কেবিনে শুয়ে শুয়ে জে. বি. প্রিস্ট্লির একটা উপন্যাস পড়ছি। ইয়র্কশায়ারের নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর তরুণ-তরুণীর লণ্ডনে প্রণয়লীলার কাহিনীতে ব্রহ্মপুত্রের উপর কেমন মন বসছে না।

বিকাল চারটেয় পলাশবাড়ি স্টেশন এল। পাড়ে অনেকগুলি বড় নৌকা বাঁধা। ঘাটের উপর কমলালেবু, ডিম ও পায়রা বিক্রি হচ্ছে। পলাশবাড়ি থেকে আবার উত্তর দিকে পাহাড়ের সার দেখা দিল। এবং ঘণ্টাখানেক পর পলাশবাড়ি ছাড়লে এক পশলা অল্প বৃষ্টি হয়ে ভাঙা মেঘের মধ্য দিয়ে চাঁদের দেখা পাওয়া গেল। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা। পাতলা মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোতে তীরের পাহাড় ও নদীতে তার ছায়া কেমন একটু অবাস্তব মনে হচ্ছে।

সাড়ে ছটার মধ্যেই স্টিমার পাণ্ডুঘাট এসে পৌঁছেছে। শিলং-যাত্রীদের পারাপারের স্টিমার অনেক আলো জ্বালিয়ে ঘাটে লেগে আছে। রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল, এখনও পাণ্ডুঘাটেই আছি। সামনে গৌহাটি শহরের আলো দেখা যাচ্ছে।

২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৬
সোমবার

কাল সমস্ত রাত স্টিমার পাণ্ডুঘাটেই নোঙর করে ছিল। আজ ভোর ছটায় সেখান থেকে রওনা হল। স্টিমার ছাড়ার শব্দ পেয়ে ওভারকোট চাপিয়ে সামনের ডেকে এলুম। গৌহাটি ও শিলং যাত্রাপথের অল্পবিস্তর পরিচিত পাহাড় নদীর দু ধারে; তাদের মাথায় মাথায় কালচে সাদা মেঘের মত কুয়াশা জমে আছে। স্টিমার উমানন্দভৈরবের কাছ দিয়ে গেল। ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে গ্রানাইট পাথরে ধার-বাঁধানো উঁচু ভিতের উপর বড় বড় গাছের ঘন বন, তার মধ্য দিয়ে ভৈরবের মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। গৌহাটি শহরের তখনও ঘুম ভাঙে নি, নদীর ধারের রাস্তায় লোক-চলাচল নেই। শহরের একদিকটার প্রায় সমস্ত দৈর্ঘ্য উজিয়ে গৌহাটির বাজার-ঘাটে স্টিমার লাগল। বেলা তখন সাতটা।

গৌহাটি শহর কামরূপ জেলার সদর; অসমীয়াদের রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রচেষ্টার কেন্দ্র। কিন্তু প্রদেশের রাজধানী শিলঙের শৈল-

চূড়ায়, যা না উত্তর-আসামের অসমীয়াদের, না দক্ষিণ-আসামের বাঙালিদের জায়গা। সেই পাহাড়ের চূড়ায় বসে বোধ হয় রাজপুরুষেরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উত্তর-দক্ষিণ দেখছেন, অসমীয়া ও বাঙালি কেউ কারও চেয়ে প্রবল হয়ে না ওঠে।

প্রাচীন পুঁথিপত্রে ও শিলালেখ-তাম্রশাসনে গৌহাটির নাম দেখা যায় গুবাকহট্ট, বোধ হয় গোরুর হাট নয়, সুপারির হাট। মেধাতিথির মনুভাষ্যে দেখেছি, দেশের একটা নির্দিষ্ট ভূভাগকে বলত হট্ট। বোধ হয় ওটা ছিল 'ইকনমিক ইউনিট'-এর নাম, যে ভূখণ্ডের লোকেরা বড় বড় বেচাকেনা একজায়গায় করত, এবং সম্ভব হাটবাজারের হাট কথাটা সেখান থেকেই এসেছে। যা হোক, শব্দের প্রত্নতত্ত্বে আর দরকার নেই। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। স্টিমার থেকে মাল নামছে বিস্তর। ডাক-হাঁকে জানছি গৌহাটি ও শিলং দু জায়গার মাল নামছে, আর তাদের তফাত করে রাখা হচ্ছে। ক্রমে বাজার-ঘাটে ধোপাদের কাপড় কাচা শুরু হল। একটা ছোট ফ্ল্যাটের সামনে বসে একটি খালাসি

খুব মনোযোগ দিয়ে একটা নীল কোর্তায় সাবান ঘষছে। রাস্তা দিয়ে দুখানা মোটরগাড়ি চলে গেল। আজ পাঁচ দিনের পর মোটরগাড়ি দেখে মনটা একটু খুশি হয়ে উঠল। নাগরিক জীবনের অভ্যাসের এমনি ফল!

২

গৌহাটি থেকে রওনা হতে বেলা বাজল এগারোটা। বেলা দুটোরও পর পর্যন্ত ডাইনে পাহাড়ের সার চলেছে নদীর প্রায় পাড় ঘেঁষে। নিবিড় বনে ঢাকা পাহাড়; হঠাৎ মাঝে মাঝে এক-একটা পাহাড়ের খানিকটা অনাবৃত কালো পাথরে মোড়া, প্রকাণ্ড ঐরাবতের পাশের মতো। এক সার পাহাড়ের পিছনে আর-এক সার, তার পর আবার এক সার, দূরে দূরে আরও-সব সারের মাথা দেখা যাচ্ছে, অতি পাতলা নীল ওড়নার মত ফিকে নীল কুয়াশায় ঢাকা। এক জায়গায় একটা পাহাড় তার সঙ্গীদের ছেড়ে আড়াআড়ি সোজা চলে এসেছে জলের মধ্যে, নদীর সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করতে। উলটো দিকের পাড় একটা চরের জিহ্বা অনেকদূর

নদীর মধ্যে এগিয়ে দিয়েছে। এ জায়গাটা স্টিমার পার হল অতি ধীরে ও সাবধানে। পাশ দিয়ে যাবার সময় নদীর এই দুঃসাহসী প্রণয়ীর রূপটি দেখতে পেলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরে মোড়া পা, তার উপর পালিশ কালো পাথরের চওড়া বুক খাড়া উঠে গেছে, রুদ্ধদুয়ার মন্দিরের কপাটের মত।

বাঁ দিকের পাহাড় সব দূরে দূরে। তৃণলেশহীন উঁচু চর চলেছে মাইলের পর মাইল— ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গলাঞ্ছনা পাশে আঁকা। অনুজ্জ্বল রৌদ্রে মনে হচ্ছে যেন চুনারি পাথরে তৈরি। আজও আকাশে মেঘ আছে, তবে রোদকে ঢাকতে পারে নি, শুধু নিষ্প্রভ করেছে।

ডান দিকের পাহাড়ের প্রাচীরটা যখন একটু একঘেয়ে বোধ হচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পাহাড় গেল দূরে সরে। পূর্ব-বাংলার শীতের নদীর পরিচিত রূপটি ফুটে উঠল। এখানে ওখানে ছড়ানো চরের শুভ্র বালু কেটে কালো নীল জলের ধারা, দিক-চক্রবালে গাছের ঘন সবুজ রেখা।

বেলা পড়ে আসছে ; কেবিনের সামনে বেতের

কুর্সিতে রোদে বসে আছি। সম্মুখে একটা গোল চর, চার দিকে নীল পাহাড়; যারা ছিল নদীর পাশে, বাঁক ঘুরে মনে হচ্ছে তারা যেন নদীর মাঝ থেকে উঠেছে। একখণ্ড কালো মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে— রূপালি জরির পাড়-দেওয়া নীলাম্বরীর আঁচল; মাঝখানে একটা চোখ-ঝলসানো গোল ফুটো দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে; নদীতে রঙের স্রোত। সব মিলে মনে হচ্ছে যেন টার্নারের একখানা ছবি।

একটা চরের ওপারে নদীর মধ্যে সূর্য অস্ত গেল; আগুনের প্রকাণ্ড গ্লোব। ঘড়িতে পাঁচটা ছ মিনিট। অনেকটা পুবে চলে এসেছি। শুক্রবার দিন সূর্যাস্তের সময় ঘড়িতে ছিল পাঁচটা পনেরো মিনিট। তবে আমার এ হাতঘড়িকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তি করা চলে না। ওর তিন দিনের গতিবিধির ফল অনেক সময় চমকপ্রদ।

স্তব্ধ ব্রহ্মপুত্রের বুকের উপর সন্ধ্যা নেমে এল। পুবে প্রতিপদের সোনালি চাঁদ, পশ্চিম-আকাশে বৃহস্পতি জ্বল জ্বল করছে।

'ইন্দ্র' ফ্ল্যাট, তেজপুর
২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৬
মঙ্গলবার

ভোরে কেবিন ছেড়ে বাইরে এসেই দেখি, বাঁয়ে তেজপুর শহর দেখা যাচ্ছে। স্টিমার ঘাটে লাগতে দেরি হল না। মালপত্র গুছিয়ে স্টিমারের লোকদের বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে এখানকার স্টিমার-স্টেশনের ওয়েটিং ফ্ল্যাট 'ইন্দ্র'তে এসে ওঠা গেল। ফ্ল্যাটের এক কেবিন দখল নিয়ে নীচে নেমে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের চর ভেঙে উপরে উঠে গেলুম শহরে। পোস্ট আপিস থেকে তোমাদের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে একটা ঝরঝরে-রকম ফোর্ড ট্যাক্সিতে সমস্ত শহর ঘুরে বেড়ালাম। ট্যাক্সিওয়ালার বাড়ি সিলেট, ছেলেবেলা থেকে এখানেই আছে। কিন্তু তেজপুর শহরের উপর তার অসীম অবজ্ঞা; বললে এটা শহর না শহরের আকার! সিলেট শহরে ট্যাক্সি চলে ষাটখানা, এখানে পাঁচখানা চলা কঠিন।

ইন্দ্র ফ্ল্যাটে নাওয়া-খাওয়া সেরে, সামনের ডেকে একটা আরামকেদারায় রৌদ্রে পা ছড়িয়ে

প্রিস্ট্‌লির সেই উপন্যাসটা পড়ছি, আর ব্রহ্মপুত্রের স্রোত ও নদীর পাড়ে টিলার উপর টিনের বাংলো-গুলি চেয়ে দেখছি।

তেজপুর শহরের গল্প মুখেই শুনো।